শীতকালীন সংখ্যা ১৪২৮

বই কুটির কলকাতা

ভূমিকা

পর পর দুটি সংখ্যা প্রকাশ করার পর '***বই কুটির কলকাতা***' উদ্যত হয়েছে তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশ করতে। শারদ সংখ্যা এবং দীপাবলি সংখ্যার সাফল্যের পর বই কুটিরের পাঁচ সহযোদ্ধা অনুভব করল বাচ্চাদের জন্য যদি একটা সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। এ নিয়ে পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটল জগদ্ধাত্রী পুজোর পরে বকুলের মিটিংয়ে। ঠিক হলো যে পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশ করা হবে ছোটদের জন্য। সারা বছর নানা ধরনের লেখা আপনারা পড়ে থাকেন 'বই কুটির কলকাতা'র ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে। লেখকরাও নানান স্বাদের লেখা লেখার সুযোগ পেতেন। তবে এবারে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল বিষয়বস্তু। বলা হয়েছিল, ছোটদের জন্য কিছু লিখতে ও আঁকতে। সকলের সহযোগিতায় প্রকাশিত হল ছোটদের জন্য '***বই কুটির কলকাতা***'র শীতকালীন সংখ্যা।

***

সম্পাদকীয়

দীপাবলী সংখ্যার পর প্রকাশিত হল '***বই কুটির কলকাতা***'র আরও একটি সংখ্যা। ছোটোদের কথা মাথায় রেখে বড়দিন ও নতুন বছরের আগমন উপলক্ষেই এবার শীতকালীন সংখ্যা প্রকাশের এই প্রয়াস আমাদের। এই সংখ্যার নতুনত্ব হলো, ছোটোদের জন্য লেখা ও আঁকা প্রকাশ। বড়োদের লেখনীতেও ফুটে উঠেছে ছোটোদের কথা। এর আগের সংখ্যাগুলিতে লেখকরা নিজেদের পছন্দ মতো লেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু শীতকালিন সংখ্যা এদিক থেকে ব্যতিক্রমী। আমাদের অনুরোধে ছোটদের কথা মাথায় রেখেই বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়েছে তাদের। এ জন্য আমরা তাদের অন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন যে বই কুটির কলকাতা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি আপনার কথা বলতে পারেন লেখার মাধ্যমে। দেখতে দেখতে তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করে ফেললাম আমরা। আগামীদিনেও যেন এভাবেই একের পর এক সংখ্যা প্রকাশ করতে পারি, তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

***

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আরাত্রিকা মন্ডল
স্বর্ণাভি
সিলভিয়া ভৌমিক
এ্যামিলিয়া ভৌমিক
পৌলোমী নিয়োগী
ঋষি ঘোষ
আরাধ্যা মজুমদার
প্রিয়াংসী সাহা
শৈকতি সাউ
সুপর্ণা কামাতি

রাহুল দে
পৃথা দে
ভাগ্যশ্রী বেজ
এবং
জুনালী বেজ (প্রচ্ছদ)

সূচীপত্র

কবিতা

ছোটোর দাবি
মৌটুসি

কবে আসবে সেই দিন?
পল্লবী সান্যাল

আলোঘর
রণজিৎ মাইতি

নতুন বন্ধু
রবীন মুখার্জি

সরকারি
দীপঙ্কর বিশ্বাস

অনুভূতি

মুখোশ
সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

সূচীপত্র

ছোটগল্প

গল্পদাদুর গল্প
সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

ইন্টারনেট ইন্টারনেট
আরিত্র সেনগুপ্ত

টিকটিকির ডিম
ছেঁড়া ঘুড়ি

ভারতীয় ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব
কুনাল দাস

সবারই একটা দিদা / ঠাম্মা থাকা দরকার
সুপর্ণা দে

গল্প

খেজুরের রস
অজ্ঞাতি গোলাপ

কিপ্টে বুড়ো ও ছেলের দল
সুনীতি মন্ডল

অন্য দেশ
অগ্নিমিতা দাস

বৃষ্টি
অজন্তা প্রবাহিতা

আরাত্রিকা মন্ডল

ছোটোর দাবি

মৌটুসি

নীল আকাশের রংটা আরো গভীর হোক-
স্বপ্নে , তালে বেশ ডানা মেলে উড়ি।
বাতাসে অক্সিজেন এত্ত ভোরে উঠুক-
কাশি ভূত যেন ছুঁতে না পারে।
মাস্ক ছাড়া খুশির দিন আসুক-
ভয়ের সাথে আড়ি হবে তবে।
ভয়ের সাথে আড়ি করে অনেক বড়ো হবো।
সবাই বলবে তুই ছোট কবে ছিলি?
আমি বলবো, আমি এখন মাকে কোলে নিতে পারি।

আলোঘর

রণজিৎ মাইতি

'ঘরটি আমার বড্ড ছোটো
বাস করা মুশকিল'
শুনে শালিক মুচকি হাসে
কাক হাসে খিলখিল।

ঘরের আবার ছোট্ট কি ভাই
আকাশ বড়ো কর
প্রেমের তারা ফুটলে ঘরে
সেটাই আসল ঘর।

অট্টালিকায় বাস করেও
কাঁদেন বটের পাখি
আমি তো কাক তুচ্ছ অতি
প্রেমের আলোয় থাকি।।

সরকারি

দীপঙ্কর বিশ্বাস

ছুটি ছুটি ছুটি ছুটি
আমাদের বছর বছর ছুটি!
কি মজা কি মজা
আমাদের বছর বছর ফাঁকি!

স্কুল নেই পড়া নেই
আমরা বেড়াই ছুটে ছুটে!
শাষন নেই ভয় নেই
আমরা চড়াই গরু খুলে!

কি মজা কি মজা
পড়াশোনা আর নেই নেই!
কি খুশি কি খুশি
ইস্কুলে আসতে নেই নেই!

কি মজা কি মজা
পড়াও নেই পরীক্ষাও নেই
খুব খুশি খুব খুশি
পুরণ ক্লাসে পাশ সকলেই

কত সুখ কত সুখ
প্রতি মাসে চাল ডাল পাই!
খুব খাই খুব খাই
স্কুলের চাল বাড়িতে খাই!

কি যে সুখ কিযে সুখ
আমাদের ভেজাবে সে বৃষ্টি!
চলরে চলরে চল
আটকায় কে দেখ রাখালী!

আয় ছুটে আয় আয়
শিক্ষক সবই দেখ ভোটকর্মী!
ভাত ঘুমে ভাত ঘুমে
শিক্ষকরা দু-বছর দেখ বাড়ি!

কবে আসবে সেই দিন?

পল্লবী সান্যাল

পড়া পড়া করো খালি বলো না তো খেলতে,
খেলার বয়স চলে গেলে পাব কি আর ফিরে?
আছে এক মোবাইল তাতে হরেক রকম গেমস –
কানামাছি – কুমীরডাঙার দিন যে হল শেষ,
পড়ার জন্য মোবাইল আছে খেলার জন্য নেই!
পরীক্ষাও দিতে হয় সেই অনলাইনেতেই।
করোনা মহামারি কেড়ে নিয়েছে সুখ,
ঘর বন্দি থেকেই সবার হয়েছে অসুখ।
খুলেছে সব স্কুলের দরজা ফিরছে সবাই ক্লাসে,
বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে প্লাসে-মাইনাসে।
কবে আসবে সেই দিন? হব সবাই এক,
খেলব – হাসব – গাইব মোরা পড়ব না তো মাস্ক।।

নতুন বন্ধু

রবীন মুখার্জি

জীবনে মোদের নিকটতম বলতে পারো কোনটি?
সে যে এক অনাত্মীয়, মুঠোয় ধরা ফোনটি।
এ যে এক মজার যন্ত্র সঙ্গে যদি থাকে
মনের দরজা দেয় যে খুলে প্রান্ত থেকে প্রান্তে।
নিঃসঙ্গ জীবনে দেয় সবচেয়ে বড় সঙ্গ
আজকে মোবাইল সবার কাছে জীবনের এক অঙ্গ
মোবাইল ছাড়া জীবন যেনো, নুন ছাড়া তরকারী
এর ই মধ্যে লুকিয়ে আছে হরেক রকমারি।
মোবাইল মোদের করতে শেখায় সহজ ভাবে কাজ
মোবাইল মোদের গড়তে শেখায় সুন্দর সমাজ।

ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপে বন্ধু পাই সহজে
জীবনের ই সুখ- দুঃখে পাই যে তাদের কাছে।
মোবাইল শেখায় আত্মনির্ভর ,আর নিজের পায়ে
দাঁড়াতে।
এর সঙ্গ থাকলে সাথে পারবে না কেউ ঠকাতে।
অন-লাইনে করবে শপিং, করবে মানি ট্রানজাকশান,
কেবল জানতে হবে সঠিক এর ব্যবহার আর ফ্যাংশন।
তবে, ভুল পথেতে করো যদি একে তুমি চালিত
ভীষণ ভাবে ঠকবে তুমি, আর হবে যে লাঞ্ছিত।
মোবাইলকে তাই ভালোবাসো, রাখো পুরো আস্থা
বন্ধু হয়ে পথ দেখাবে, দেবে জীবনের সঠিক রাস্তা।

স্বর্ণাভ

মুখোশ

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

দৃষ্টি বিনিময়ের সময় বোধহয় হয়নি তখনও ,কিন্তু বড় ভরসার বন্ধু হয়ে উঠেছিলিরে তুই।
ক্রমশঃ মনের মধ্যে ......চঞ্চলতা, কাশের গুচ্ছের দুলুনি,আকুলতা......এক আকাশ নির্ভরতা, স্বপ্ন ,আরো যে কত কিছু..........

কিন্তু হিসেবে যে বড্ড পটু তুই চিরকাল, হাত ছাড়লি অকারণে, আমায় অন্ধকারে ঠেলে বেশ তো চলে গেলি নক্ষত্রের দিশারী হয়ে।

ভালোবাসার উল্টো পিঠে আজ না ভালোবাসা,
শত সহস্র আলোকবর্ষ দূরত্ব,
একসঙ্গে কী করে আর আকাশ ছুঁই বলতো?

আমার আকাঙ্খা দিয়ে তোকে প্রেমিক বানিয়েছিলাম,
আবার আমার রাত জাগা চোখই তোকে অপ্রেমিক বানিয়ে দিল চিরতরেই.....
"এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কি জানিস?"

"নাতো"......
মুচকি হেসে উত্তর দিলাম
"মানুষ চেনা রে"।
মুখ আর মুখোশের আড়ালে থাকা মানুষ চেনা এই পৃথিবীতে বড্ড কঠিন।

বই
কুটির
কলকাতা

সিলভিয়া ভৌমিক

শ্যামলিয়া ভৌমিক

গল্পদাদুর গল্প

সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

এসো সোনা বন্ধুরা আজ তোমাদের একটা গল্প শোনাব। তোমরা কীসের গল্প পছন্দ করো - ভূতের না রাক্ষস খোক্ষসের? আজকে সেসব গল্প শোনাবো না। আজ এমন একটা গল্প শোনাবো তোমাদের , যাতে তোমরা কিছু শিখতে পারো । মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারো। বন্ধুরা, চুপটি করে এবারে গল্পটি শোনো।

কিশোর নামের একটি ছেলের খুব গরীব পরিবারে জন্ম হয়। মা,বাবা ট্রেনে,বাসে গান করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ছোট্ট কিশোর খুব কম বয়স থেকে মা - বাবার গান শুনে শুনে রপ্ত করে ফেলে। কখনো সেও মা - বাবার সঙ্গে যেত। ট্রেনে,বাসে গান করতো। লোকেরা বাচ্চা ছেলেটির গান শুনে খুব আনন্দ পেত। সবাই খুশি মনে ওর দুহাত ভরে টাকা দিত। কিশোরের মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে গান শুনতে সবার খুব ভালো লাগতো।এইভাবে সে বড়ো হতে থাকে।

কিশোরের বাবা নন্দকুমার চিন্তা করলেন,ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবেন। যা আয় হয় তাতে দিব্যি চলে যাবে। সুতরাং কিশোরের জীবনটা নষ্ট হতে দিতে পারি না।যেই ভাবা সেই কাজ। নন্দকুমার ছেলেকে নিয়ে শহরের বড় একটা স্কুলে গেলেন। প্রধান শিক্ষক কিশোরকে দেখেই চিনতে পারলেন । তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন,"কি তুই মন দিয়ে পড়াশুনা করবি তো"? বালক কিশোর আমতা আমতা করে মৃদু স্বরে বলল: হ্যাঁ পড়াশোনা করব। নন্দকুমার ছেলেকে সাপোর্ট দিয়ে বললেন: স্যার, আমার ছেলেটার খুব বুদ্ধি। ও পড়াশোনা করতে চায় । আমরা মুখ্য সুখ্য মানুষ। পড়াশোনা শিখিনি । আমাদের বড় শখ ছেলেটাকে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করবো।

শিক্ষক খুব খুশি হলেন। তার কথা শুনে একটি ফর্ম ফিলাপ করে দিয়ে, নন্দকুমারের স্বাক্ষর নিয়ে ছেলেকে ভর্তি করে নিলেন। সরকারি স্কুল। সুতরাং কিশোর এই স্কুল থেকে বিনা পয়সায় ইউনিফর্ম এবং বই পাওয়া গেল অনায়াসে। প্রধান শিক্ষক রবিন কাকুর আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

তারপর থেকে কিশোর নিয়মিত স্কুল যায়। মন দিয়ে লেখাপড়া করে। কিশোরের লেখাপড়ায় প্রতি মনোযোগ দেখে, শিক্ষকেরা খুব খুশি হন। ওকে সবদিক থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সে এই ভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রতিটি ক্লাসে প্রথম হয়।

কিশোর একদিন ডাক্তার হয় সে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেচে চাকরি নেয়। গ্রামের মানুষেরা গরিব। অর্থের অভাবে শহরে গিয়ে ভালোভাবে চিকিৎসা করতে পারেনা। কিশোর গ্রামের মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে । অসহায় গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াই। ওর মত চিকিৎসক পেয়ে, গরীব মানুষেরা ভরসা পায়। সময়ে-অসময়ে রোগীদের বাড়ি গিয়ে কিশোর চিকিৎসা করে। এমন স্বনামধন্য চিকিৎসকের সুনাম চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিশোর একদিন চিকিৎসাশাস্ত্রে মস্ত বড় ডাক্তার হয়ে ওঠে।

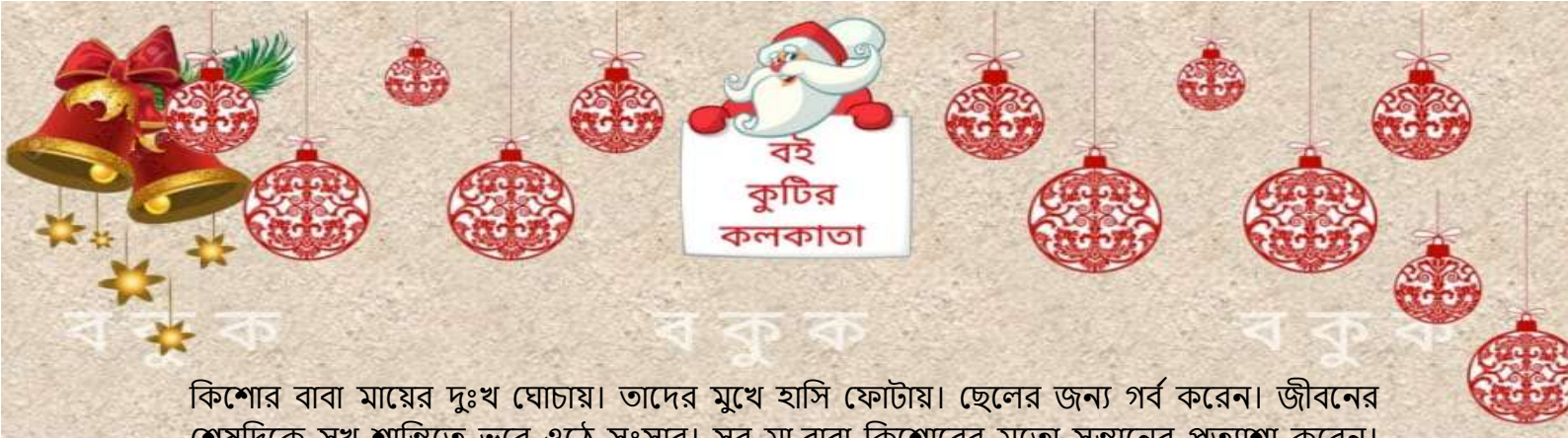

কিশোর বাবা মায়ের দুঃখ ঘোচায়। তাদের মুখে হাসি ফোটায়। ছেলের জন্য গর্ব করেন। জীবনের শেষদিকে সুখ শান্তিতে ভরে ওঠে সংসার। সব মা-বাবা কিশোরের মতো সন্তানের প্রত্যাশা করেন। বাচ্চারা, তোমরাও খুব ভালো করে পড়াশোনা করবে। মা-বাবার কথার অবাধ্য হবে না। মিথ্যে কথা বলবে না কোনদিন। মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা মহাপাপ। তোমাদের আদর্শ যেন কিশোরের মত হয়।তোমরা পড়াশোনা করে মানুষের মত মানুষ হও কেমন? সবাই ভালো থেকো। সুস্থ থেকো। আবার অন্যদিন তোমাদের গল্প শোনাবো কেমন?

***

ইন্টারনেট ইন্টারনেট

আরিত্র সেনগুপ্ত

সেই সকাল থেকে দুই ভাই কম্পিউটারে কাজ করতে বসেছে। একজন বসেছে অফিসের কাজ নিয়ে, আরেকজন বসেছে স্কুলের ক্লাস করতে। কিছুক্ষণ ক্লাস করার পরে ছোট ভাই হঠাৎ করে ওয়েব সিরিজ দেখতে শুরু করলো। বড় ভাইয়ের চোখে পড়তেই বলল, "কিরে তোর আর ক্লাস নেই?" তখন ছোট ভাই বলল, "আছে। কিন্তু করতে ইচ্ছা করছে না।" বড় ভাই দেখল এভাবে চললে মুশকিল। তখন সে ছোট ভাইয়ের দিকে ঘুরে গিয়ে বলল, "জানিস ইন্টারনেট কী? ইন্টারনেটে কী হয়?" ছোট ভাই এত এডভান্স যে ঝটপট উত্তর "ইন্টারনেটে আবার কী হবে? সার্চ করা যায়, ওয়েব সিরিজ দেখা যায়। আবার কী, গুগোল এ ক্লাস করা যায়।" বড় ভাই বলল, "না ইন্টারনেট মানে সবার মধ্যে একটা যোগাযোগ। আগে যেমন লোকে পায়রা উড়িয়ে চিঠি লিখে যোগাযোগ করত বা কারো মাধ্যমে কোনও খবর পেতে, এখন সেটাই হচ্ছে ইন্টারনেট। জানিস তো তুই যখন রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাস একটা রাস্তার ওপর অনেক গাড়ি থাকলে যেমন জ্যাম হয়ে যায় ইন্টারনেটেও কিন্তু জ্যাম হয়। এটাকে আমরা ট্রাফিক বলি। ইন্টারনেটেরও কিন্তু একটা লিমিট আছে। "কতজন লোক একসাথে ইন্টারনেটে কাজ করতে পারে?" ছোট ভাই বললো, "কই আমরা তো এসব বুঝতে পারিনা।" দাদা বললো "আমরা বুঝতে পারলেও আমাদেরকে বুঝতে দেওয়া হয় না। আজকে তুই ইন্টারনেট ঘাটলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন তথ্য পাবি। কত কিছু জানতে পারবি, শিখতে পারবি, যেটা হয়তো সবসময় বই পড়ে পারবি না। আজকে ইন্টারনেট ঘাটলে বাইরের কোনও দেশের কোনও বিখ্যাত লেখকের বই চোখের সামনে খুলে পড়তে পারবি। বাইরের কোনও দেশের কোনও ভালো আঁকা দেখতে পারবি। কোনও ভালো ইনফরমেশন তোর পড়ার জন্য তুই নিতে পারবি। ইন্টারনেট এতটাই ভাল, এতটাই উপযোগী। তবে হ্যাঁ, কিছু দুষ্টু লোক রয়েছে যারা ইন্টারনেটকে বাজে কাজে ব্যবহার করে। বিজ্ঞান আমাদের ইন্টারনেট উপহার দিয়েছে। ভালো না বাজে, কিসে ব্যবহার করব সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের।" "তাহলে দাদা তুই

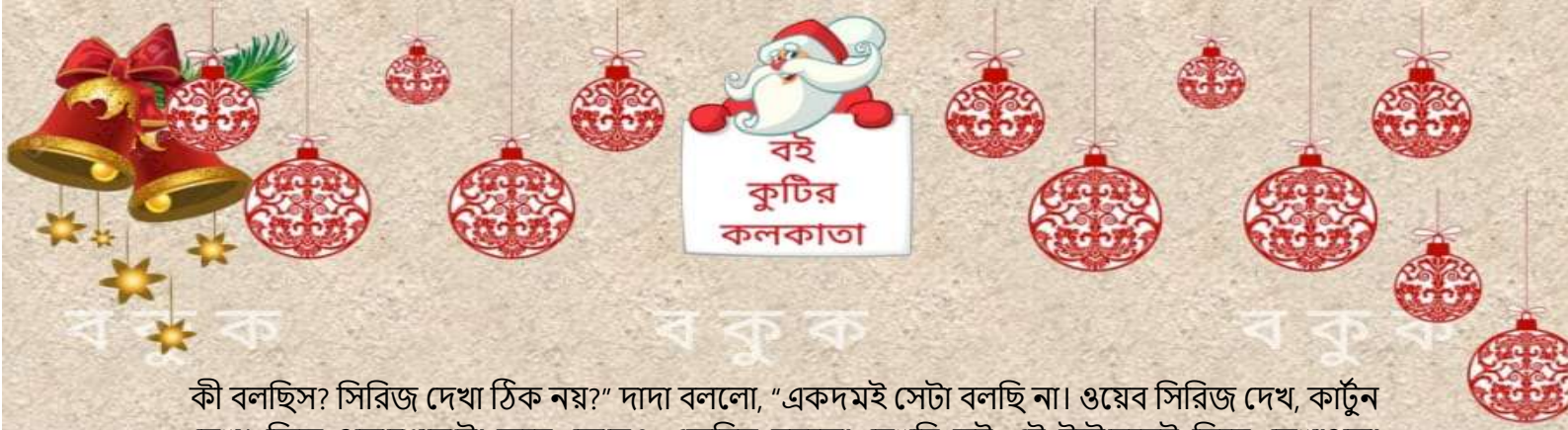

কী বলছিস? সিরিজ দেখা ঠিক নয়?" দাদা বললো, "একদমই সেটা বলছি না। ওয়েব সিরিজ দেখ, কার্টুন দেখ। কিন্তু পড়াশোনাটা করে কোনও একদিন হয়তো দেখবি তুই এই ইন্টারনেট নিয়ে লেখাপড়া করছিস দেখে আরও ডেভলপ করছিস। জানিস আমরা ইন্টারনেটে যেভাবে সার্চ করি ওই ভাবে সার্চ করলে প্রচুর রেজাল্ট দেবে গুগোল। কিন্তু ওই ভাবে সার্চ করলে হবে না । সার্চ করার আলাদা পদ্ধতি আছে। সেটা না হয় তোকে অন্য আরেকদিন শেখাব। আজ শুধু এটাই বলব ইন্টারনেটকে ভালো কাজে ব্যবহার কর আর নিজে শেখ, অন্যকে শেখা।"

***

টিকটিকির ডিম

ছেঁড়া ঘুড়ি

ছোটবেলায় আমাদের কাছে শীতের সকালটা ছিল অ্যাডভেঞ্চারের মতন। বেশিরভাগ দিন ঘুম ভাঙতো রায় দাদুর রেডিওর শব্দে। তারপর থেকে চলত অ্যাডভেঞ্চার। তোমার গায়ে কতটা জ্বর দেখি বলে, দিদি জেঠু কাকুদের কপালে কিংবা গলায় ঠান্ডা হাতটা ছুঁয়ে দিতাম। সব সময় যে সবাই ছোট বলে ছেড়ে দিত এমনটা নয়, মাঝে মাঝে উত্তম-মধ্যমটাও জুটতো। সকালে লেপের তলায় বসে মা পড়া করাতো স্কুলের। মাথায় যে কিছুই ঢুকতো না সেটা মা বুঝতেই পারতো, ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে আছি, মা মাঝে মাঝেই বলতো চোখটা একটু কোচলে নে, মন দিয়ে পড়। কিছুক্ষণ পরেই নয় রান্নাঘর না হয় বাড়ির কোন কাজে উঠে যেত। তখন থেকে আমিও জানালার বাইরে প্রকৃতির হাওয়ায় ভেসে আছি, কত পাখি উড়ে যাচ্ছে, যেহেতু উত্তর কলকাতায় বেড়ে ওঠা তাই মাঝে মাঝেই গুলিয়ে ফেলতাম কোনটা লগগাঁ পায়রা, বগা পায়রা, আমার বাড়ির পাশেই পায়রার বোম লাগানো হতো, কত রকম পায়রা কোনটা সাদা, কোনটা কালো ওসব কিছু দেখতে দেখতে বেশ ভালোই কাটতো সকালটা। তারপরেই পরতো স্কুল যাওয়ার ডাক, মা তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিত, আজকের মতন বডি অয়েল নয়, সরষের তেল; আরেকটা বুলি আওড়াতে "দু'ফোঁটা নাকের ফুটোয়ে, দু'ফোঁটা কানের ফুটোয়ে সর্দি দিদি আসবেনা আর।" তারপর ভাই বোন সবাইকে একসাথে এক থালায় খাইয়ে দিত। কে খায় কে খায় বাবু খায় না দিদি খায়। আর প্রায় সময় বলতো খাওয়া শেষ হবার পর "আগে গেলে বাঘে খায় পরে গেলে সোনা পায়।" উড়তি পাওনা ছিল রঙিন সোয়েটার। সারাটা দিন স্কুলে শীতের দিনগুলোতে খুব তাড়াতাড়ি সন্ধে নামতো তাই স্কুল ছুটির পর খেলার সময়টা অনেকটা কম। তারই মধ্যে কখনো ছোঁয়াছুঁয়ি, কখনো কানামাছি, কখনো বা কুমির ডাঙা, কিছুটা তাড়াও থাকতো বাকি খেলাটা খেলতে হবে পাড়ায় এসে। তাই তড়িঘড়ি স্কুলে যে আনতে যেত তার হাত ধরে বাড়ি ফেরা। প্রায়শোই বাড়ি ফেরার পর গন্ধ পেতাম এক মিঠে পাটালি, মরিচা, কিংবা নলেন গুড়ের, পায়েস না হলে পিঠে। আজকালকার দিনের মতন ওয়াও মোমো কিংবা কিন্ডার

জয় ছিলনা। ছিল দাঁত লললোরি লজেন্স কিংবা টিকটিকির ডিম, না হয় পপিন্স। পাড়ার খেলা শেষ করে বাড়ি ফেরা, খিদেও পেতো জমিয়ে। এই শীতে প্রায়শই জুটতো গুড়ের পায়েস, পাটিসাপটা, চিতই পিঠা। এক পেট খাবার পর নিদ্রাদেবী সবিনয় আবেদন করতেন উষ্ণ কম্বলের নীচে, কিন্তু জননী যে ধারণ করতো চন্ডী মূর্তি, বই নিয়ে বস আমি আসছি। খুব জোর হলে রাত ন'টা, তারপরেই অদৃশ্যভাবে ভর করত, না হয় প্রচন্ড পেট ব্যথা করছে, না হয় প্রচন্ড ঠান্ডা লেগে মাথা ব্যথা করছে। দু এক ঘাঁ উত্তম-মধ্যম খেয়ে আশ্রয় নিতাম কাকুর কম্বলের নিচে, মাথায় হাত বুলিয়ে বরণ করিয়ে দিত নিদ্রাদেবীকে। রাতের খাওয়াটা ঘুম ঘুম চোখেই।

আজ কত বড় হয়েছি স্বাদ পেয়েছি ওয়াও মোমো কিংবা বারিস্তা লিয়াবজা কিন্তু আজও ঠোঁটে লেগে আছে মরিচা কিংবা নলেন গুড়ের পায়েস পিঠের।

***

ভারতীয় ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব

কুনাল দাস

প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। যদিও এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত যে উপাদান পাওয়া গেছে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট সময়কালের মানুষদের জীবনযাত্রা - চিন্তাভাবনা কী ধরনের ছিল, এই উপাদান গুলির মধ্য থেকে তা আমরা অনেকটাই জানতে পারি। এই উপাদানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত, সাহিত্যিক উপাদান এবং দ্বিতীয় : প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। যুগে যুগে সাহিত্যিক উপাদান গুলি প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ক্ষেত্রে তা থাকে না। তাই প্রাচীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই উপাদানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল- লেখ, মুদ্রা, স্থাপত্য ভাস্কর্য, নাম মুদ্রা বা অভিজ্ঞান মুদ্রা (seals)। লেখা গুলি রচনার জন্য ব্যবহৃত হতো সোনা, রূপা, তামা, ব্রঞ্চ-র পট্টি। মন্দির ও মূর্তির গত্রদেশ ও এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। লেখাগুলি লেখা হতো ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠীতে। কোথাও কোথাও একত্রে দুই লিপিরই ব্যবহার দেখা গেছে। এছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক লিপিও দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের সবথেকে প্রাচীন লিপি হিসেবে ধরা যায় ব্রাহ্মী কে। এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন "এশিয়াটিক সোসাইটির" তদানিন্তন সম্পাদক জেমস প্রিন্সেপ, ১৮৩৭ -এ। এটি লেখা হতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। খরোষ্ঠী ছিল উল্টো। এটি লেখা হতো ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই ধরনের লেখা থেকেই জানা যায় মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর লেখাতে নিজেকে "দেবনৎ প্রিয় প্রিয়দর্শি" বলে অভিহিত করেছেন।

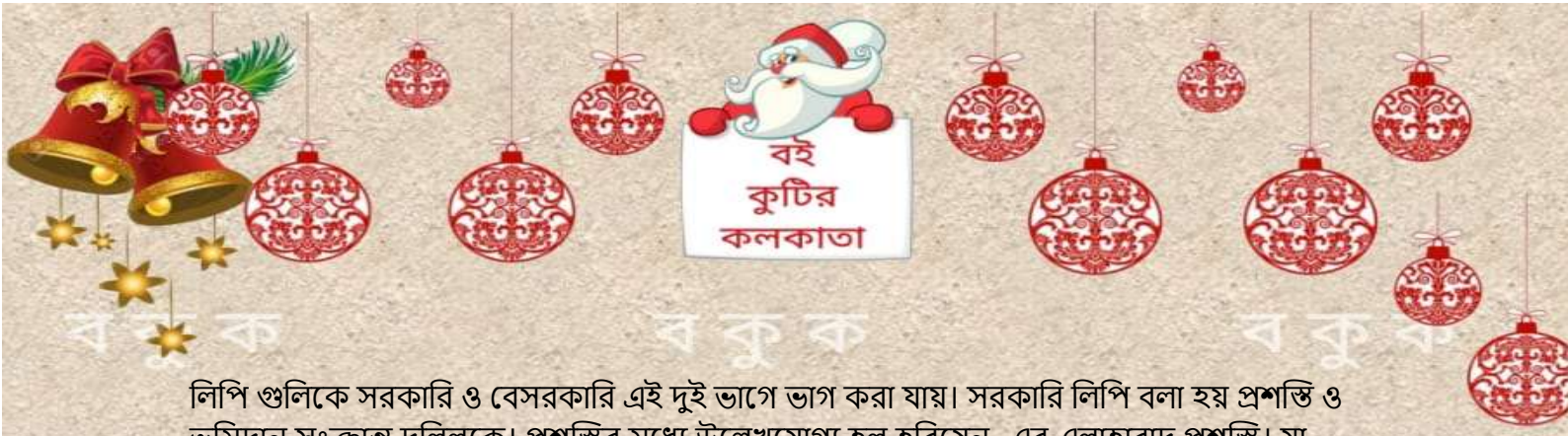

বই
কুটির
কলকাতা

লিপি গুলিকে সরকারি ও বেসরকারি এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি লিপি বলা হয় প্রশস্তি ও ভূমিদান সংক্রান্ত দলিলকে। প্রশস্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হরিষেন -এর এলাহাবাদ প্রশস্তি। যা থেকে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ও তার সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। সাতবাহন রাজা সাতকহনীর সম্বন্ধে জানা যায় তাঁর মা গৌতমী বনাশ্রীর রচনা থেকে। গোয়ালীর প্রশস্তি থেকে জানা যায় প্রতিহার রাজ ভোজের কথা। চোল রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কথা জানতে পারি তার সভাকবি রবিকীর্তি রচিত আইহোল প্রশস্তি থেকে।

ভূমি দান সংক্রান্ত লেখা গুলি মূলত কৃষিকাজের সম্বন্ধে ধারণা দেয়। চাষের পদ্ধতি, জমি মাপার পদ্ধতি এইগুলি থেকে জানা যায় ।

বেসরকারি লিপি গুলি মূলত ধর্মসংক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের ধর্মীয় রীতি প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কে এগুলি ধারণা দেয়। অনেক সময় উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা এগুলি রচনা করত, ফলে সেই সময়কার রাজনৈতিক চিত্রও প্রস্ফুটিত হত। এছাড়া বিদেশি লেখা থেকে ভারত সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত বাণিজ্যিক সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য এই লেখাগুলি থেকে পাওয়া যায়।

মুদ্রা হল অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব। ব্যাকট্রিয় গ্রিক, কুষান, সাতবাহনদের ইতিহাস জানার জন্য মুদ্রার ওপর নির্ভর করতে হয় অনেকটাই। ভারতে প্রাপ্ত সবথেকে প্রাচীন মুদ্রা হল নন্দ-মৌর্য আমলের মুদ্রা বা “Punch Marked Coins” । গ্রিক আক্রমণের পর থেকে ভারতীয় মুদ্রায় রাজার নাম খোদাই করা শুরু হয়। মুদ্রা অনেক সময়ই লিখিত তথ্য কে প্রমাণ করতে সাহায্য করে। যেমন লেখা থেকে গুপ্ত ও শকদের দ্বন্দ্বের কথা জানা যায়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শকদের আদলে তৈরি রৌপ্য মুদ্রা থেকে বোঝা যায় শকদের তারা পরাজিত করেন এবং তাদের শাসিত অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন।

অভিজ্ঞান মুদ্রা বা Seals ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাচীন ইতিহাস রচনা করতে। ভারতে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন Seal গুলি পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতা থেকে, যেগুলি পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি। এগুলি ব্যবহার করতেন প্রশাসক, বণিক সম্প্রদায়, ধর্মীয় প্রশাসকগণ। শীলাতে “গণরঋদ"-এ শব্দ পাওয়া যায় যা থেকে মনে করা হয় সে সময় গণ রাজ্যের উদ্ভব হচ্ছিল।

উভখননের ফলে প্রাপ্ত মন্দির, মূর্তি, ভাস্কর্য ভূমিকা ও এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। ধর্মীয় তথ্য ছাড়াও এগুলি থেকে জানা যায় সেই সময়কার উচ্চ শিল্পভাবনার কথা। কোন আধুনিক পদ্ধতি ছাড়া, যন্ত্রাংশ ব্যবহার ছাড়া সেই সময়ে শিল্পীরা যে অসাধারণ স্থাপত্যের সৃষ্টি করেছে তা আজও সকলকে আকর্ষণ করে। চমৎকৃত করে। আবার অনেক সময় খননের ফলে উঠে আসে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো শহরও।

***

সিলভিয়া ভৌমিক

স্বর্ণাভ

সবারই একটা দিদা / ঠাম্মা থাকা দরকার

সুপর্ণা দে

বড় হওয়ার পরেও যাঁদের দিদা/ঠাকুমা থাকে তাঁরা বোঝে 'ভগবানে'র ছাতার তলায় থাকার আনন্দ কী! ছোটবেলায় জোর করে হাতে টাকা গুঁজে দেওয়া থেকে শুরু করে বড় হয়ে পছন্দের জিনিস কী, তার দাম কী, না থাকলে তার টাকার জোগান দেওয়া, এই সমস্ত কাজ দিদা/ঠাম্মারা করে থাকেন। বিভিন্ন গল্প বলা। সে গল্প কোনো এক রাজা-রানি হোক কিংবা রাজকুমারীর। অনেকে দিদা/ঠাম্মা ছাড়া ঘুমাতে পারে না। সারাদিন ধরে সে কী করল তা তাঁদের কাছে না বললে ঠিক শান্তি পাবে না। তাঁরা বড় কাছের মানুষ, বেস্টফ্রেন্ড বলা যেতে পারে। মায়ের কাছে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র দিদা/ঠাকুমারাই। কিছুতেই তাঁরা তাঁদের নাতি/ নাতনির গায়ে হাত তুলতে দেন না। অনেক সময় মায়েরা তাঁদের কথা না শুনে বাচ্চাদের গায়ে হাত তোলেন। তাতে দিদা/ঠাম্মারা ভীষণ রেগে যান। পরে খুব আদর করেন। কেটে যাওয়া যায়গায় যত্ন করে ওষুধ লাগিয়ে দেন। ঘুম পাড়িয়ে দেন।

দিদা/ঠাম্মার সঙ্গে বাজারে যাওয়া। এ এক অন্যরকম আনন্দ! তারপর নিজের ইচ্ছেমতো লজেন্স, পছন্দের খাবার খাওয়া। এক অদ্ভুত অনুভূতি। ছোটবেলায় সেসব খুব স্বাভাবিক মনে হলেও বড় হওয়ার পর বোঝা যায় কী ভালো দিন ফেলে এসেছি।

দিদা /ঠাম্মাদের শেষ বয়সটা বেশ কষ্টকর। তাঁরা নাতি/নাতনিদের সঙ্গে ভালো থাকেন। অনেক সময় বাবা-মায়েরা তাঁদের কাছে যেতে দেননা বাচ্চাদের। কী আচরণ তাঁদের প্রতি! কী অবহেলা! বাবা-মায়েরাও ভুলে যায় যে তারা একসময় তাঁদের কাছে থেকেছেন। শিক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু আজ তাঁদের বয়স হয়ে গিয়েছে বলে এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছে। তাঁরা নাকি কোনো কাজে আসেননা। আসলে দিদা/ঠাম্মাদের মতো মূল্যবান কিছুই হয়তো এ পৃথিবীতে হয় না। হবে না।

***

পৌলোমী নিয়োগী

খেজুরের রস

অজ্ঞাতি গোলাপ

বয়স তখন হবে ১৪ কী ১৫ বছর, বাড়ির সবার সাথে ঘুরতে গিয়েছিলাম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের বেল পাহাড়ি এলাকায়। আজকের মতন এত হোটেল রিসোর্ট তৈরি হয়নি।পাহাড়ের কোলে বেলপাহাড়ি জঙ্গলে মোরা আড়িংদহ অঞ্চল সেখানে একটা ছোট্ট হোমস্টে, যতটা মনে পড়ে বৃহস্পতিবার গিয়ে পৌঁছে ছিলাম। তিনদিন থেকে রবিবার ফেরা। শীতকাল কলকাতা শহরের থেকে অনেক অনেক বেশি ঠান্ডা। যেহেতু বয়সে সবার থেকে ছোট তাই সকলেই চোখে চোখে রাখতো, পাহাড়ি অঞ্চল সাথে জঙ্গল কলকাতা শহর থেকে অনেকটা দূরে মনটা কেমন শান্ত। পাইন, শাল, সেগুন, খেজুরের বন নাম-না-জানা আরো কত গাছ। কত পাখি সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ডিঙা কুসুম লেক এর কথা, শান্ত পাহাড়ি ঝিল বলা চলে কত পাখি নাম না জানা, যেহেতু পাহাড়ি অঞ্চল দুপুরে মনে হয় বিকেল নেমেছে সূয্যিমামা গেছে পাটে, সাথে খেজুরের রসের গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। আমরা যে হোমস্টেতে ছিলাম ঠিক তার সামনে খেজুর রস বিক্রি করতো চরণ সিং, বাড়ির সবাই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খেজুর রস খেতে যেতাম তার কাছে। সবাইকে নারকেলের খুড়িতে রস দিত চরণ কাকু, সাথে গুড় জাল দিতো, রস খাওয়ার পর নাম না জানা পাহাড়ি গাছের পাতা দিয়ে বানানো ঠিক দেখতে আগেকার দিনের তিনকোনা ফুচকা খাবার পাতার মতন, তাতে গুড় দিত চরণ কাকু। দামটা ঠিক মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ে আমাকে বলতো ছোট বাবু, খেজুর রস খাবে খেজুর রস খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়। শহর অঞ্চলে থাকার দরুন এই সকল কিছু অনেকটা অবাক করত আমাকে। আমিও চরণ কাকুর সাথে অনেক কথা বলতাম। চরণ কাকুর একটা মেয়ে ছিল, আমার থেকে বয়সে ছোট আড়িংদহ প্রাইমারি স্কুলে পড়তো। আমাদের হোমস্টে তে ঢোকার পথে একটা খেজুর গাছ ছিল। সেই গাছের নিচেই রস, গুড় জাল দিতো চরণ সিং। সকালে চরণ কাকুর মেয়ে বিথী কিশলয় নিয়ে পড়াশোনা করত আগুনের ধারে বসে। যেহেতু পাহাড়ি অঞ্চল তাই সন্ধে নামতো খুব তাড়াতাড়ি, আমাদের শহরের মানুষের মতন নয় তাদের জনজীবন। সন্ধের পর জনমানবহীন হয়ে পড়তো অঞ্চল। আর অন্ধকার কেমন এক মিশকালো, শহরে রাতের মতন নয় একটু রাত হলেই শিয়াল আর ভাল্লুকের শব্দ শোনা যেত। তাই রাতে ওই অঞ্চলে কেমন কেউ একটা বের হতো না, হোমস্টে থেকে আমাদেরকে না করে দিয়েছিল রাতে কোথাও না বেরোতে। আমরা সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সন্ধের মধ্যে চলে আসতাম হোমস্টেতে। সন্ধের পর থেকেই সেখানেই থাকতাম। হোমস্টের সামনেই মাদল বাজিয়ে গান করত, নাচ করতো এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা। রবিবার ফেরা শহরের পথে, ফিরে এসে এ সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েক মাস আগে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গিয়েছিলাম বেলপাহাড়ি। হঠাৎ মনে পড়লো পুরনো দিনের বেলপাহাড়ির কথা, সেই হোমস্টে, আমি বললাম আমি বুক করছি আরিংদহ অঞ্চলে ওই হোমস্টেটা আর নেই একটা নতুন হোমস্টে হয়েছে হোমস্টে বললে ভুল হবে রিসোর্ট আধুনিক প্রযুক্তি। যেদিন পৌঁছলাম এদিক ওদিক ঘুরে লোকজনকে

জিজ্ঞাসা করলাম পুরনো হোমস্টের কথা, তেমনভাবে কেউ কিছু বলল না, চরণ সিং ও বিথী সিং কোথায় জিজ্ঞাসা করলাম একটু এড়িয়ে গেল। হোটেলের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম তারাও বলল দাদা আমরা তো নতুন এসেছি ঠিক বলতে পারব না। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেখলাম খেজুর গাছের নীচে খেজুর গুড় জাল দিচ্ছে একজন লোক নাম বুদন, ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা এখানে তো চরণ সিং খেজুর রস জ্বাল দিতেন, তাঁর একটা মেয়ে ছিল নাম বীথি, দুজনের কাছে উত্তর পেলাম চরণ কাকার কথা বলতে পারব না, বিথী এখন এখানে থাকেনা, বিথী বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করে এখন পশ্চিম মেদিনীপুরের এক স্কুলে পড়ায়, ওখানে বিয়ে হয়েছে।
অনেক অনেক পরিবর্তিত বেলপাহাড়ি, নাম, না জানা গাছ গুলোর নাম, আজও হয়তো কিছুটা জানি। কিন্তু এই পাহাড়ি অঞ্চলে নাম না জানা নদীর মতন হারিয়ে গেছে চরণ সিং ও বিথী।

***

ঋষি ঘোষ

কিপটে বুড়ো ও ছেলের দল

সুনীতি মন্ডল

রানি পিসি ডাক দেয়,,
এই ছেলেরা মেলায় যাবি?
দোলনা চড়াবো।
আজ বিকেলে আসিস্ তবে
ঘুড়ি ওড়াবো।
অর্ক বলে, হীরার দাদু পয়সা দেবে তো?
বুড়োটা ভীষণ হাড় কিপটে।
মেলায় গিয়ে সব দোকানে জিজ্ঞেস করে এটা কত দাম,,,, ওটা কত দাম?
শেষকালে কিনে দেয়
কড়াই ভাজা,
আর বলে কড়াই ভাজা ভারি মজা,
সাথে থাক চিনাবাদাম।
টুসি হাত পেতে বলে
ও দাদু পয়সা দাও
কিনবো মেহেন্দী,
বুড়ো টা দৌড়ে গিয়ে ঠুস্ করে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে
বলে এই নে,
ঘরে গিয়ে বেটে নে জলদী,
শরীরের কল- কবজা গুলো জং ধরাসনে।
ঠাকুমার রান্না ঘরে আছে শিল নোড়া,
ইচ্ছে করে ঐ শিলে ফেলে,
বুড়োর টাক মাথাটা দিই থেঁতলে।
হাতে তুলে নোড়াটা
ভেঙে দিই থোবড়া গালের, ফোকড়া দাঁতের গোড়াটা।
পূজার সময় যতই করি বয়না,
একটাও জামা কিনে দেয় না।
রানী পিসি খুব ভালো।

পূজার সময় সবাইকে কিনে দেয় নতুন জামা, খাবার, খেলনা গাড়ি, আরও কতকিছু।
তাইতো সবাই ছুটি পিসির পিছু পিছু।
আমরা সবাই চুপিচুপি বুড়োর ঘরে গিয়ে নারকোল নাড়ু খাই চুরি করে ,
কুলের আচার, চালতার আচার, আরও কতকিছু খাই,
বুড়োর আওয়াজ পেলে দৌড়ে পালাই।
বুড়ো লম্বা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে ,
রানি পিসি মুখ চেপে মুচকি হাসে।
পিসি আমাদের খুব,,,,ভালোবাসে।
আর টেকো বুড়ো টা?
যেই না শীতকাল পড়লো,
ওমনি কাঠ- কয়লায় আগুন দিলো।
গরম জামা কিনবে না,
বলে শীতের বেলা ঠাণ্ডা উপভোগ করতে হয়, একটু আগুন সেঁকে নিলে আর ঠান্ডা লাগবে না।
সকাল সন্ধ্যা দুবেলা দু-কাপ চা আর দুমুঠো মুড়িতেই,
কিংবা দুটো বিস্কুট খেয়ে দিন কাটাবেই।
বুড়ো ঢেঁকি পাতে না, চাল কুটতে দেয় না।
গুড় কেনে না, বলে জিরোন কাটের গুড় দাম বেশি,
আমরা না হয় চিটচিটে ভেলি গুড়ের পিঠে খেয়ে হবো খুশি।
দুটো করে চিতৈ পিঠে আর বাটিতে একটু ভেলি গুড় দিয়ে আমরাও খেতাম মজা করে।
বিকাল বেলা দাদু সবাইকে মেলায় নিয়ে গিয়ে একটা করে ভাণ্ডার কিনে দিয়ে বলতো
এই নে চারটে পয়সা,
বাজে খরচ করিস নারে।
সব জমা রাখবি মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে।
আমরা সবাই খিল খিল করে হেসে,
দাদুকে জড়িয়ে ধরি ভালোবেসে।

***

অন্য দেশ

আগ্নিমিতা দাস

তিতলি জানলা দিয়ে বাইরে বৃষ্টি পড়া দেখছিল। বৃষ্টির একটা নিজস্ব গন্ধ আছে যা ওর খুব ভালো লাগে। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল ,খুট করে দরজাটা খুলে গেল| রুমা ঘরে ঢুকে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলল_সোনা ম্যাথ কোশ্চেন পেপার সলভ করেছো" মাথা নাড়িয়ে তিতলি বলল __না , মাম্মা আজ ভালো লাগছে না , চল না তুমি আর আমি আলো নিভিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখি। রুমা কিন্তু কিন্তু করে ও রাজি হয়ে গেল।তিতলি এক লাফে আলো নিভিয়ে জানলা দিয়ে অন্ধকারে মন দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছিল, দেখছিল বলা ভুল, মন দিয়ে শুনছিল।

রুমা তিতলির চোখে হাজার ওয়াটের বিজলি বাতি জ্বলে ওঠা দেখে চুপ করে রইল .. তিতলি ক্লাস নাইনে পড়ে .. কাল ওর অঙ্ক পরীক্ষা কিন্তু কোথায় সে অংক করবে না ,আলো নিভিয়ে বৃষ্টিতে দেখছে!তিতলি ছোট থেকে একটু অন্যরকম। একটু বেখেয়ালি একটু আনমনা। বুদ্ধি আছে কিন্তু পড়াতে কিছুতেই কন্সেন্ট্রেশন করতে পারেনা ।তাই এভারেজ রেজাল্ট করে। অথচ কী অপূর্ব ছবি আঁকে, দারুণ গান গায়, সর্বোপরি দারুণ কবিতা লেখে! রুমা অবাক হয়ে যায় যে মেয়ে নিজের হৃদয় উজাড় করে পাতার পর পাতা কঠিন শব্দের মিল করে এত চমৎকার ইংলিশ কবিতা লিখে সে ইংলিশে এত গড়পড়তা নম্বর পায় কেন?

তিতলি কলকাতার বালিগঞ্জের নামজাদা স্কুলে পড়ে। প্রিন্সিপালের ম্যাম ডি'সুজা একবার রুমাকে ডেকে বলেছিলেন_তিতলি গুহের ক্লাস টিচার রিপোর্ট করেছেন ওর কোথাও কোন প্রবলেম আছে ! ক্লাস নাইনে সাধারণত এইরকম সিলি মিসটেক দেখা যায় না ! তাছাড়া ওর অ্যাটিটিউড প্রবলেম আছে, মাঝে মাঝে তিতলি টিচারদের সাথে অ্যারোগেন্ট বিহেভ করে, আপনি একটু যদি কাইন্ডলি কাউন্সেলিং করান তাহলে খুব ভালো হয়। রাশভারি গলায় প্রিন্সিপাল ম্যাম বললেন __বুঝতে পারছেন তো এই ব্যাচটাই সামনের বছর বোর্ড এক্সাম দেবে তাই ওদের টপ টু বটম পারফেকশন আমাদের প্রয়োজন!"

রাহুল অফিসের কাজে প্রায় বিদেশে থাকে তাই কথাগুলো একাই হজম করতে হলো রুমাকে। রাহুল বড় সাইক্র্যাটিস্টটের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিল। প্রতিটি সেশনেই প্রায় রাহুলের অনুপস্থিত থাকার জন্য তিতলিকে নিয়ে রুমা অফিসে থেকে দৌড়তে দৌড়তে হাজির হতো । লাস্ট সেশনের পর ডঃ মুখার্জি হেসে বললেন_সি ইস অ্যবসুলেটলি ওকে! ভেরি নাইস অ্যান্ড চার্মিং গার্ল! আপনাদের কেন মনে হল ওর মধ্যে অ্যাবনরমাল কিছু আছে ,অবশ্য আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝেমাঝে কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন ! এমন কি আমারও, বলে হো হো করে হেসে ফেললেন ।

সুন্দরী, ভীষণ সফিস্টিকেটেড ডঃ মুখার্জি তার রিমলেশ চশমা ঠিক করতে করতে বললেন," হ্যাঁ মানছি ওর একটু স্পিকিং প্রবলেম আছে! আই মিন স্ট্যামার করে কিন্তু তার জন্য থেরাপি আছে , ঠিক হয়ে যাবে! আমার তো মনে হয় পার্টিকুলার কোন থেরাপির প্রয়োজন নেই । বাড়িতে রিসাইটেশন বা রিডিং পড়তে পড়তে এমনি এমনি ঠিক হয়ে যাবে।

চেম্বারের বাইরে তিতলি তখন ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে দুটো বিড়ালছানাকে নিয়ে আদর করছিল। সে ছোট থেকে জীবজন্তু খুব ভালোবাসে। ফ্রিজ থেকে দুধ বার করে রাস্তার বিড়ালকে খাওয়াবে, নিজের চকো বিস্কুট কুকিজ দেবে.... শীতকালে বা বৃষ্টির সময় তাদের বারান্দায় কুকুর বা বিড়াল ছানা স্থান পায়। তখন তিতলির পড়াশোনা শিকেয় তোলা থাকে... দিন রাত চলে যায় কুকুর আর বিড়ালের সেবা করতে।

তিতলিকে নিয়ে রুমা রাহুলের চিন্তার শেষ নেই। দু'জনের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড লেখাপড়ার দিক থেকে বেশ ভালো। রাহুল ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ...একসময় কলেজের টপার ছিল তার মেয়ে তিতলি এত মিডিওকার স্টুডেন্ট। সব থেকে বড় কথা ক্লাস টিচারের রিপোর্ট মত তিতলির অ্যাটিটিউড প্রবলেম নিয়ে রুমা একটু ধন্দে রয়েছে। এমনিতে তিতলি খুব বাধ্য মেয়ে, কোনদিন উঁচু গলায় কথা বলে না। বন্ধুবান্ধব একটু কম ,চাপা স্বভাবের! ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে সহেলীর সাথে একটু ভাব বেশি। কিন্তু উগ্রতা কোনদিন প্রকাশ পায়নি। তবে অনেকদিন আগে তিতলি তখন খুব ছোট চার বছরের , পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস বোসের বাড়িতে বিকেল বেলায় কী কারণে গিয়েছিল। রুমাদেরকে ফাইন পোর্সেলিনের প্লেটে মিষ্টি জাতীয় কিছু খেতে দিয়েছিল সেটা টেবিল থেকে তুলতে গিয়ে ওদের কাজের ছোট মেয়েটির হাত থেকে প্লেটটা পড়ে যায় !সেই সময় আপাতত দৃষ্টিতে এলিগ্যান্ট মিসেস বোস পারিপার্শ্বিক সবকিছু ভুলে বাচ্চা কাজের মেয়েটিকে গালে সপাটে এক চড় দেয় ! সবার সামনে চড় খেয়ে মেয়েটি প্রথমে কিছু না বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে যায় পরে ডুকরে কেঁদে ওঠে ! হঠাৎ করে তিতলি মিসেস বোসের হাতে কামড় দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মহিলার হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে গেছিল ...কোনমতে রুমা ক্ষমা-টমা চেয়ে সে যাত্রায় লজ্জার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিল...সেই একদিনের জন্য তিতলির মধ্যে উগ্রতা লক্ষ্য করে।

তিতলি খুব নরম মনের মেয়ে| তার পরিচয় রুমা অনেকবার পেয়েছে! রাস্তাঘাটে কোনো ভিখারিকে দেখলেই মায়ের কামিজ ধরে টান দেয়, রোদে গরমে যে কোনো সেলসম্যান বেল বাজলে তিতলি তাকে এক গ্লাস জল অফার করে! বাড়ির রান্নার মাসি জলখাবার খেয়েছে কিনা সেটাও তিতলি মনে করে লক্ষ্য রাখে! তিতলি নিজেকে শামুকের মতো সব সময় গুটিয়ে রাখত... প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও স্কুলের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো না! একবার ক্লাস ফাইভের স্কুলের ফাংশনে রিহার্সালের সময় নাটক দেখার জন্য স্কুলের দারোয়ান, আয়ামাসিরা উঁকিঝুঁকি মারছিল। তিতলি নিজে নাটকে অংশগ্রহণ না করলেও দারোয়ান, আয়ামাসিদের নাটকের প্রত্যেকটা সংলাপ ইংরেজিতে হচ্ছিল বলে

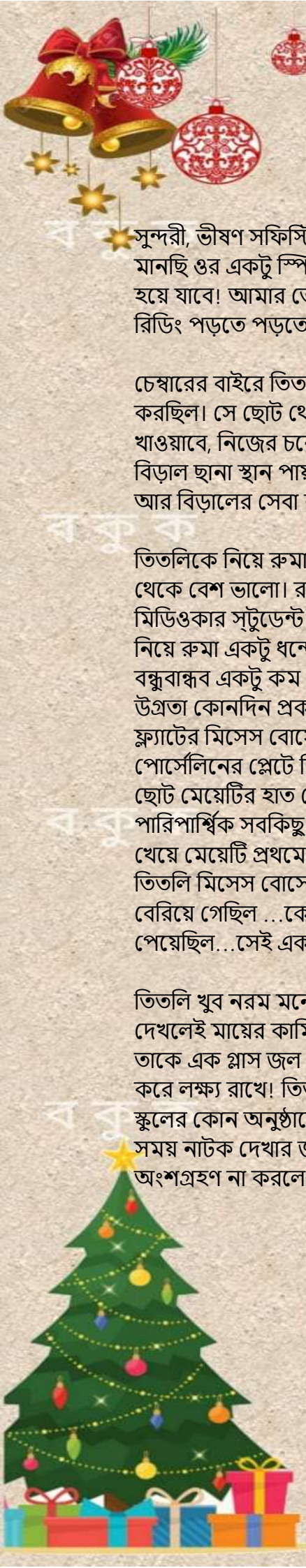

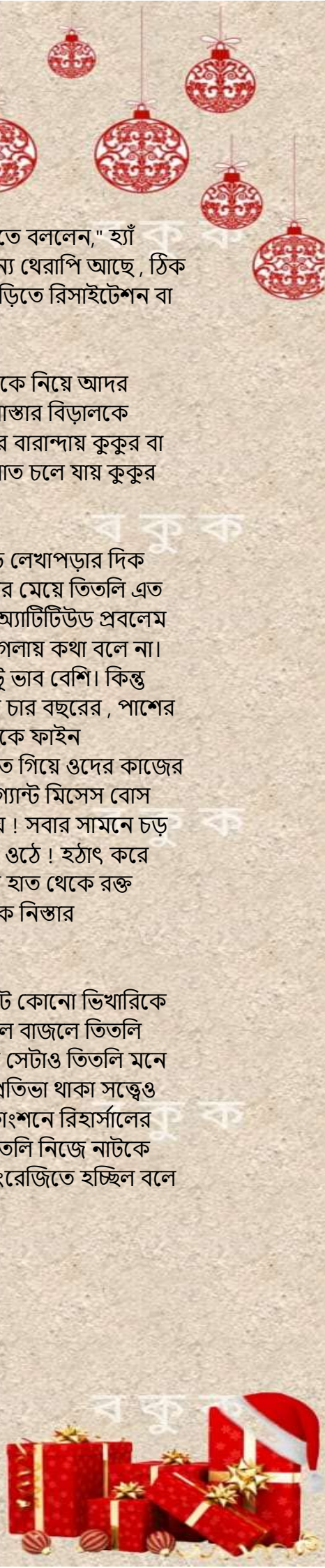

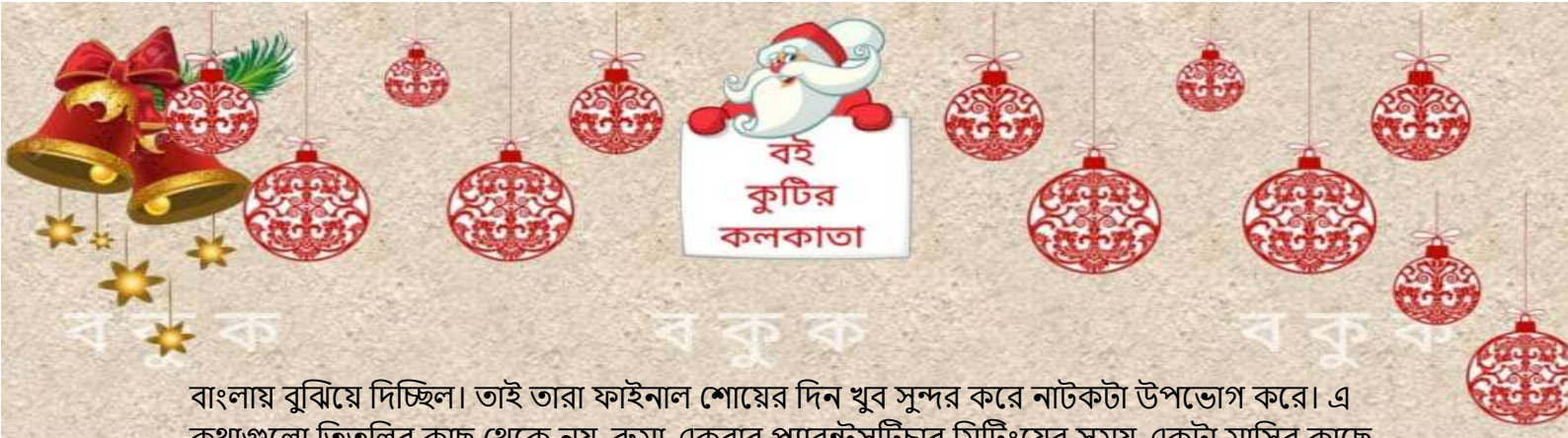

বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তাই তারা ফাইনাল শোয়ের দিন খুব সুন্দর করে নাটকটা উপভোগ করে। এ কথাগুলো তিতলির কাছ থেকে নয়, রুমা একবার প্যারন্টসটিচার মিটিংয়ের সময় একটা মাসির কাছে শুনেছিল সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়।

ক্লাস টিচার মিসেস মেহেতা সামনের বোর্ড এক্সামের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বলে বলেন ,_কম্পিটিশন ইজ টু হাই ,ইউ হ্যাভ টু উইন দ্য রেস! তিতলির এই কথাগুলো শুনতে একটুও ভাল লাগছিল না। সে জানলা দিয়ে দেখছিল পাশের গাছে দুটো চড়াই পাখি কিভাবে বাসা বাঁধছিল।

_তিতলি স্ট্যান্ড আপ!মিসেস মেহেতার বাঁজখাই গলার আওয়াজে তার চমক ভাঙে। রাগে ফেটে পড়ে মিসেস মেহেতা। আবার গার্জেন কল, যথারীতি রাহুল নেই ; অফিস থেকে রুমা দৌড়াতে দৌড়াতে প্রিন্সিপালের কাছে হাজির! মিসেস ডিসুজা তার স্বভাব সিদ্ধ মিলিটারি শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, এনাফ ইস এনাফ,অনলি ফোকাস অন স্টাডি, বি প্রাক্টিক্যাল!!

সেই দিন বাড়ি ফিরে রুমা ঘরের দেওয়ালের সব কার্টুন ছবি ছবির সাথে লেখা কবিতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তিতলি হা হয়ে গিয়েছিলো মায়ের রণংদেহি মূর্তি দেখে। ছুটে সে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল এনে মাকে দেয়। তারপর মায়ের মাথায় হাত রেখে বলে_ মা ,আমি আর কোনদিন ছবি আঁকবো না কবিতা লিখবো না , ওয়ান্ডারল্যান্ডে থাকবো না....শুধু পড়াশোনা করবো প্রমিস! মেয়ের কথায় রুমা আর থাকতে না পেরে হাউমাউ করে তিতলিকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো!!

হঠাৎ একদিন ক্লাসে নতুন ইংলিশ ম্যাম এলেন পিয়ালী ম্যাম !রোগা ফর্সা চশমা পরা। তিতলির কেন জানি না এক দেখাতেই ম্যামকে খুব ভালো লেগে গেল । সবথেকে ভালো লাগলো পিয়ালী ম্যাম সবার সঙ্গে আলাপ পর্বের পর যখন বললেন বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে! নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘ গুলোকে দেখে কার কি মনে হচ্ছে চটপট লিখে ফেলো ! এইরকম কিছু অভিনব পন্থায় লেখা স্কুল জীবনে তিতলির এই প্রথম। সব থেকে বড় কথা পড়ার বাইরে নিজের চোখে দেখে অন্তরের অনুভূতিকে লেখার প্রয়াস এই প্রথম । এই প্রথম কেউ স্কুলের চার দেওয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে মুক্তির স্বাদ নিয়ে কিছু লিখতে বলল। তিতলির চার দেওয়ালের মধ্যে হাঁপ ধরে যায়।

ধীরে ধীরে পিয়ালী ম্যাম তিতলির হৃদয় জয় করে নিল। চমৎকার পড়ান! তিনি যখন শেক্সপিয়ার পড়ান , ক্লাসের সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে।পিয়ালী ম্যাম নানারকম ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে ক্লাস করাতেন, বলে সবাই খুব ভালবাসত।তিতলির সুন্দর আঁকার প্রতিভার, লেখার প্রতিভা পিয়ালী ম্যামের কাছে ধরা পড়ল।ম্যাম ভীষণভাবে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আলাদা করে প্রতিটি লেখা কারেকশন করে দিতেন, আঁকার সাবজেক্ট নিয়ে নানা রকম আইডিয়া দিতেন।

পিয়ালী ম্যামকে এই জন্য টিচারদের বিস্তর টিকাটিপ্পনী শুনতে হয়েছে। বর্ণালী ম্যাম স্বাগতা ম্যামকে বলেই ফেললেন _পিয়ালী তো অল্পবয়সী আমির খানের ফ্যান বোধহয় তাই# তারে জামিন পারের নিকুম্ভ স্যার হতে চাইছে।রমলা ম্যাম মাঝপথে বলে উঠলেন_ ওমা তা কি করে হবে! আমির খান তো মেল ! পিয়ালী তো ফিমেল ,নিকুম্ভ স্যার আর্ট টিচার আর পিয়ালী ইংলিশ টিচার ! প্রাইভেট স্কুলের হিউজ সিলেবাস কমপ্লিট করা, বছরের মধ্যে একগাদা পরীক্ষার কোশ্চেন বানানো, রেজাল্ট বানানো তার ওপরে উঁচু ক্লাসে একস্ট্রা ক্লাস নেওয়া সব সামলিয়ে নিকুম্ভ স্যার হওয়া চাট্টিখানি নয় ভাই!! টিচার্স রুমে সমবেত হাসির রোল পড়ে যায়... পিয়ালী শান্ত স্বরে বলে ওঠে _চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই আসলে অ্যাডোলেশন পিরিয়ডের কিছু ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা ভয়-ভীতি জড়তা থাকে! তারা সবসময় নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না একটা হীনমন্যতায় ভোগে আমরা যদি একটু তাদের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিই ক্ষতি কি ! স্কুলের মধ্যে থেকেই যেটুকু যা হয় হবে !ওদের অন্য প্রতিভাগুলোকে যদি একটু উৎসাহ দিই!তাহলে হয়তো ওরা লেখাপড়াতে ও মনোযোগ দেবে।

মিসেস মেহতা পিয়ালীর দিকে তাকিয়ে বলল_ আসলে তুমি রবি ঠাকুরের দেশ থেকে এসেছেতো তাই তোমার মধ্যে এখনও গুরু-শিষ্যের আদর্শের ভাবনা রয়েছে।
পিয়ালী শান্তিনিকেতন থেকে পড়াশোনা করে, তার মাসির বাড়ি থেকে কলকাতার এই স্কুলে শিক্ষকতা করছে। উনি এবার সুরটা নরম করে বললেন_ এইসব স্কুলে আদর্শ মাথায় রেখে চলা যায় না , যেখানে এত বিপুল সিলেবাস কমপ্লিট করা সম্ভব হয় না সেখানে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার কি করে নেব বল !সেই জন্যেই যারা গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রী বাড়ি থেকেই লেখাপড়া করে আসে প্রাইভেট টিউশন ভালো, গাইডেন্স ভালো নিজেরা সিরিয়াস তাদের দিকে আমরা ফোকাস করি স্কুলের ভালো রেজাল্টের জন্য। তাছাড়া আমাদের সকলেরই তো সংসারধর্ম রয়েছে। আর আমাদের প্রত্যেকের ঘরে এরকম একেকটা অবতার রয়েছে যাদের পেছনে আমাদের কালঘাম ছুটে যায়! তাই ঘরে বাইরে আর নিখুঁতভাবে ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার নেওয়া সম্ভব হয় না রে! পিয়ালির গাল টিপে আদর করে বললেন _বিয়ে থা ,করো তাহলে সব বুঝবে! পিয়ালী লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে অ্যানুয়াল কনসার্টের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। পিয়ালীর কাঁধে কালচার ডিপার্টমেন্টের অনেক ভার পড়ল। এমনিতে পিয়ালী খুব এফিশিয়েন্ট এবং নতুন ! পুরোনরা এসব দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল। কিন্তু মাঝেমধ্যে এসে পরামর্শ দেওয়ার বদলে টিকাটিপ্পনী আর

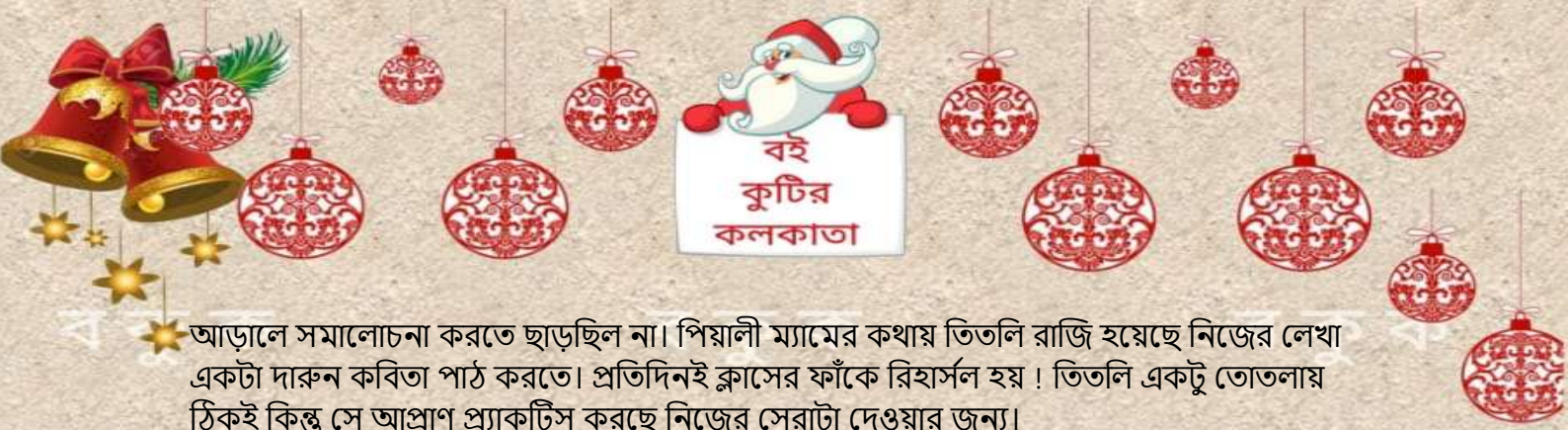

আড়ালে সমালোচনা করতে ছাড়ছিল না। পিয়ালী ম্যামের কথায় তিতলি রাজি হয়েছে নিজের লেখা একটা দারুন কবিতা পাঠ করতে। প্রতিদিনই ক্লাসের ফাঁকে রিহার্সল হয় ! তিতলি একটু তোতলায় ঠিকই কিন্তু সে আপ্রাণ প্র্যাকটিস করছে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য।

স্কুলের সবাই প্রোগ্রামে এক মুখ দেখতে অভ্যস্ত তাই পিয়ালীর নতুন আবিষ্কারে সবাই অবাক। অংকের তমাল স্যার যে সব সময় অংক ক্লাসে তিতলিকে কম নম্বর পাওয়ার জন্য মজা করেন তিনি পিয়ালীকে আলাদা করে ডেকে বললেন _এটা আমাদের স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন! প্রেস্টিজিয়াস গেস্টরা আসবে! সরস্বতী পুজোর ফাংশান নয় বা ট্যালেন্ট হান্ট শো নয়! যা করবে ভেবেচিন্তে করো! "

পিয়ালী হেসে বলল _একটুও ভাববেন না ! ফ্যান্টাস্টিক হবে ! এক মুখ দেখতে দেখতে সবাই বোর হয়ে গেছে !এবার একটু অন্যরকম হোক না।
দেখতে দেখতে অ্যানুয়াল প্রোগ্রামের দিন চলে এলো। রাহুল আর রুমা পিয়ালী ম্যামের কাছে খুব কৃতজ্ঞ তাদের মেয়েকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। তিতলি কে তার ঘেরাটোপ থেকে বের করার জন্য। তিতলী ও খুব এক্সাইটেড সেজেগুজে এসেছে... টেনশনে রাতভর ঘুম হয়নি।

প্রোগ্রাম শুরু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিতলির নাম ঘোষণা করা হল। তিতলি আস্তে আস্তে মঞ্চে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াল, যখন স্পটলাইটটা তিতলির ওপর পড়ল ও যেন সামান্য কেঁপে উঠল। চারিদিক অন্ধকার মঞ্চের আলোতেই সামনে দর্শকাসনে বসা মিসেস ডিসুজা ও আমন্ত্রিত গণ্যমান্য লোকেদের দেখে তিতলি হঠাৎ করে নার্ভাস হয়ে গেল। চারিদিক অন্ধকার মনে হতে লাগলো! কিছু মনে করতে পারল না! সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো কবিতাটা বলার ,একটা বর্ণ আওয়াজও বার করতে পারলো না! সে চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই কোন শব্দ বের হচ্ছে না চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল একটা শব্দ বের হলো না । পিয়ালী ম্যাম, রাহুল, রুমা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল এই বুঝি তিতলি শুরু করবে। চিল এ. সি হলঘরে ও তিতলি দরদর করে ঘামতে লাগল!

পাঁচমিনিট, দশ মিনিট ,পনেরো মিনিট, অপেক্ষার পর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে আস্তে আস্তে পর্দা ফেলে দেওয়া হলো। গ্রিন রুমে এসে তিতলি দাঁড়াতেই তমাল স্যার পিয়ালী ম্যামকে বলে উঠলেন," দেখলেন তো আপনার আবিষ্কার নতুন ট্যালেন্ট হান্ট! অনুষ্ঠানের শুরুতেই কিরকম মাটি করে দিল !মিসেস মেহেতা আগুনঝরা দৃষ্টিতে তিতলির দিকে তাকিয়ে বললেন," ডিসগাস্টিং ! "পিয়ালী ম্যামের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না তার সারা মুখে কে যেন একরাশ কালি লেপে দিয়েছে! যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিতে সে শুধু একবার তিতলির দিকে তাকালো মুখে কিছু বললেন না ,কিন্তু যা বোঝার সে বুঝে গেল।

গ্রিন রুম থেকে তিতলি বেরিয়ে মায়ের কাছে এসে বলল সে ওয়াশরুম থেকে আসছে। তিতলী বেরিয়ে যাওয়ার আধ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও তিতলি আসছে না দেখে রুমা রাহুলকে চিন্তিত হয়ে তিতলির

কথা বললো, রাহুল বলল _চুপচাপ বসে থাকো যথেষ্ট সিনক্রিয়েট তোমার মেয়ে করেছে ,আর তুমি এভাবে যাওয়া আসা করে অন্য গার্জিয়ানদের অসুবিধা করো না ....চিরকালের এডিকেট মানা রাহুলের কথা শুনে রুমা চুপচাপচাপ নিজের সিটে বসে রইল।

তিতলি ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে সোজা স্কুলের গার্ডেনে হাঁটতে লাগল। যারা প্রতিনিয়ত আঘাত দেয় তাদের আঘাতে বোধহয় মানুষ কষ্ট পায় না! কিন্তু ভালোবাসার মানুষের কাছে একটু অনাদর একটু অবহেলা অমর্যাদা পেলেই কোথায় বুকটা মুচড়ে ওঠে! ঝাপসা চোখে সে হঠাৎ দেখতে পেল দারোয়ান কাকু বোধহয় ভুল করে ছাদের দরজায় তালা দিতে ভুলে গেছে।
ফাংশানের মধ্যে পনেরো মিনিটের যখন ব্রেক হলো, তখন রুমা আর থাকতে না পেরে আশেপাশে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল তিতলিকে কেউ দেখেছে নাকি তার বন্ধুরা সবাই বলল তিতলিকে তো তারা কেউ দেখেনি ! রাহুল তখন রীতিমত নার্ভাস! ছুটে গ্রিনরুমে পিয়ালী ম্যামকে জিজ্ঞাসা করল তিতলীকে দেখেছেন! সবাই এক বাক্যে না বলল।

সেই ঘটনার পর তারা প্রোগ্রাম নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে হয়ে পড়েছিল, আর তিতলিকে কেউ দেখেনি। সবাই জানে তিতলি তার সিটে বসে মা-বাবার সঙ্গে প্রোগ্রাম দেখছে... এরপর শুরু হলো তোলপাড়!

রুমার থেকে বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে রাহুল। এমনকি অত রাশভারি মিসেস ডিসুজা পর্যন্ত রুমার কাঁধে হাত রেখে বলছেন_ এত চিন্তা করবেন না! শি ইজ অলসো মাই চাইল্ড, কিছু হবে না। পিয়ালী ম্যাম দারোয়ান কাকুকে সঙ্গে নিয়ে তন্নতন্ন করে স্কুলের প্রতিটি কোনা ছুটে ছুটে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুলের ছাদের দরজাটা খোলা দেখে তমাল স্যার লাফিয়ে ছাদ থেকে ঘুরে এসে দেখলেন কোথাও কিছু নেই! মিসেস মেহতার মুখ থমথমে টেনশনে ঘামছেন! রুমা আকুল হয়ে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে। হঠাৎ করে সহেলি বলে উঠলো _আচ্ছা আমাদের স্কুলের পিছনের গার্ডেনে তিতলি নেইতো!

স্কুলের পিছনের গার্ডেন সবাই অবাক হয়ে গেল! দারোয়ান আর আয়া মাসিরাও জানালো ছুটি হয়ে গেলে পুলকার আসতে দেরি হলে তিতলি একা একাই স্কুলের পিছনে একটা জায়গা আছে... স্কুলের নিজস্ব প্রপার্টি কিন্তু ওই দিকটা আর স্কুল মেনটেন করে না, পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। সেখানে সবুজ গাছগাছালির মধ্যে নাকি তিতলি প্রজাপতি ধরে ,বিড়াল নিয়ে খেলে, পাতা ,ফুল কুড়িয়ে বই এর মাঝে রাখে। মাঝে মাঝে পাখির পালক ও খুঁজে পেয়ে জমায়। এসব কথা সহেলি বকবক করে বলছিল।

সবাই ছুটতে ছুটতে কাঁটাতার সরিয়ে ওই পরিত্যক্ত জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। ইট কাঠ পাথরের বড় বড় অট্টালিকার মাঝখানে এখানে যেন সুন্দর করে সাজিয়ে কেউ এক টুকরো সবুজকে এনে দিয়েছে। শীত শেষ হয়েছে বসন্তের আরম্ভ! চারিদিকে বড় বড় গাছ, ডালে ডালে শিমুল ,পলাশের ছোঁয়া,

একটানা কোকিলের ডাক স্তব্ধতাকে আরো বাড়িয়ে দিল! রুমার হঠাৎ নজরে পড়লো একটা কাঠের বেঞ্চের ওপর গুটিসুটি মেরে তাদের ছোট্ট তিতলি শুয়ে আছে...রুমা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেখল কী নিষ্পাপ মুখ।

সবুজ পাগল মেয়ে তিতলি প্রকৃতির মাঝে পরমানন্দে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, মনে হচ্ছে না তার কোন কষ্ট আছে দুঃখ আছে যন্ত্রণা আছে। সারা মুখে ছড়িয়ে রয়েছে অনাবিল শান্তি! তিতলি মনে হয় চলে গিয়েছে স্বপ্নে সেই দেশে যেখানে নেই তাসের দেশের মতো কঠোর অনুশাসন , নেই ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতা, নেই পার্সেন্টেজের মাপকাঠি, বড়দের চোখরাঙানিও নেই !আছে খালি স্বপ্ন আর স্বপ্ন! যে স্বপ্ন দেখতে আজকাল প্রতিটি বাচ্চা ভুলে গেছে! তাদের ইচ্ছে ,তাদের খুনসুটি, তাদের গান ,নাচ, তাদের কবিতা ,তাদের হাসি ,ভালোবাসা তাদের কল্পনার রামধনু মাখা রঙিন দেশে রয়েছে !!

***

আরাধ্যা মজুমদার

বৃত্ত

অজন্তাপ্রবাহিতা

ঋভু ক্লাস ফাইভে পড়ে। কুড়ি থেকে একুশ এই দুবছরে করোনার প্রভাবে ওর পরিচিত পৃথিবীটা একেবারেই পাল্টে গেছে। সকালে উঠে স্কুলে যাওয়ার জন্য ছুটাছুটি করতে হয় না। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না। বাড়িতে বসেই অনলাইন ক্লাস হচ্ছে। আর হোমওয়ার্কও অনলাইন সাবমিট করছে। সবার জন্য বাড়িই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও সুরক্ষিত জায়গা।

শীতের ছুটিতে বিন্দিয়া ম্যাম ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের জন্য বড্ডো অদ্‌ভুত কাজ দিয়েছেন। প্রচলিত প্রবাদকে বুঝিয়ে একটি গল্প লিখতে হবে। গুগল অথবা ইউ টিউব থেকে কপি পেস্ট করলে চলবে না। অনেক ভেবে কুলকিনারা করতে না পেরে ঋভু মায়ের দ্বারস্থ হলো।
-মা ! আমায় একটু হেল্প করো।
- হ্যাঁ সোনা। নিশ্চই করবো।
-ম্যাম আমায় "as you sow ,so shall you reap" প্রভাবের ওপর রিয়েল স্টোরি লিখতে বলেছেন। বুঝতে পারছিনা কী লিখবো।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সোনালী ছেলের কাছে বসলো। "ঋভু, তোর মনে আছে, গতবছর গরমের ছুটিতে যখন দাদুর বাড়ি গেলাম। দাদুর বন্ধু সুন্দরদাদু আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। ওনার বাড়ি গেলাম। দুর্গাপুর থেকে ইলামবাজারের রাস্তায় ওনার বাড়ি। কত গাছপালা , ফুলে ফুলে সাজানো সুন্দরকাকার 'সুন্দর-ভিলা'।
-হ্যাঁ। মনে আছে।
- সুন্দরকাকার পুরোনাম সুন্দর সান্যাল। উনি ফরেস্ট অফিসার ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গলে ওনার পোস্টিং হতো । কখনো আসামের কাজিরঙা আবার কখনো বিহার বা রাজস্থানের কোনো বিখ্যাত জঙ্গলে। সারাজীবনই উনি বনেজঙ্গলে বন্য জন্তুদের সাথে কাটিয়েছেন। আমি যখন ছোট ছিলাম উনি তখন মধ্য যৌবনে ছিলেন । অসম্ভব সুন্দর ছিলেন দেখতে। ছ'ফুট মতো লম্বা,মেদ হীন চেহারা। মাথায় সর্বদাই কাউবয় হ্যাট। পায়ে দামি জঙ্গলবুট আর হাতে থাকতো স্টাইলিশ চুরুট। একদম হলিউড হিরো। এখন ওনার ধুতি পরা সাদামাটা চেহারা দেখে বোঝাই যায় না এককালে লুক ও স্টাইলে উনি যেকোনো হলিউড, বলিউড নায়ককে টেক্কা দিতেন । যেমন হ্যান্ডসাম তেমনি স্টাইলিশ মানুষ ছিলেন। বন্যপ্রাণী শিকার করা ওনার শখ ছিল। ওনার মেজাজ ও কাঠখোট্টা স্বভাবের জন্য বিশেষ কেউ ওনার ছায়া মাড়াতো না। আমার বাবার সঙ্গে কী করে এতো ভাব হয়ে গেছিল কে জানে ? ওনার আমন্ত্রণে আমরা কাজিরাঙা বেড়াতে গেছিলাম। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি।

বিশাল ফরেস্ট বাংলোতে উনি থাকতেন। সেখানে ঢুকতেই কেমন যেন আমার গা ছমছম করতে লাগলো। বিশাল ড্রয়িং রুম। একদিকের দেওয়ালে বাঘের মাথা সমেত একটি ছাল ঝোলানো রয়েছে। আরেক দেওয়ালে একই রকম আরেকটি মাথা সমেত বাঘের ছাল । আমার কৌতূহলী চোখ দেখে কাকু বুঝতে পারলেন আমার মনের কথা।
বললেন, "বাঘ আর বাঘিনী। একই দিনে দুজনকে শিকার করেছিলাম" ।
ওনার কথায় আমি ঢোক গিললাম। মায়ের পাশে একই সোফায় গুটিশুটি মেরে বসেছিলাম। মনে বেশ ভয় ছিল, আর কি দেখবো কে জানে। ডাইনিং হলে যেতেই চোখ পড়লো ধনেশ পাখির ঠোঁট দিয়ে বানানো নানা রকম ডেকোরেশন পিস্ দিয়ে সাজানো দেয়াল।
পুরো বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে মনে হয়েছিল কোনো এনিম্যাল মিউজিয়াম।
পুরো বাড়িটাই জীবজন্তুর স্কেলেটন, দেওয়ালের বিভিন্ন রেকে বোতলে ভরা বিভিন্ন ধরণের পাখি ও সাপের ডিমে সুসজ্জিত ছিল। সব দেখে কেমন যেন গা শিউরে উঠছিলো আমার ।
বিকেলে বাড়িতেই মুরগি কেটে ছাল ছাড়িয়ে রাতের রান্না হলো। চোখের সামনে এসব দেখে আমার গা গুলোতে লাগলো। এক দানা খাবারও গলা দিয়ে নামল না। হরলিক্স আর বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়লাম। রাতে ধুম জ্বর এলো।
সব কিছু দেখে বাবা প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে কাকুকে বকুনি দিলেন, "সুন্দর, ঘরের শোভা বাড়ানোর জন্য মৃতপ্রাণীর দেহ মাউন্ট করে লাগিয়ে রেখেছো। কোথাও ধনেশ মেরে তার ঠোঁট দিয়ে ডেকোরেশন বানিয়েছো। কোথাও দেখছি হরিনের মাথা। কোথাও গন্ডারের খড়্গ। এ কেমন ধরণের রুচি? এখন খাবার জন্য গোটা গোটা প্রাণী হত্যা করে হজম করা। উফফ ! একি ইলিশ, মাগুর যে বাজার থেকে টাটকা এনে কেটে খেয়ে ফেললাম ? তোমার বাড়ি এসে আমার মেয়ে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়লো, তোমার বৌদির মুখচোখও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ।
তুমি ফরেস্ট অফিসার। কোথায় তুমি প্রাণীদের প্রাণ রক্ষা করবে, তা না করে শুধুই ওদের শিকার করেছো। এগুলো কি তোমার শখ? এতো শুধু প্রাণী হত্যা নয় ক্রূর মানসিকতার পরিচয়। তোমার এই ব্যাপার স্যাপার আমার মোটেও ভালো লাগলো না।"

কাকু হাসতে হাসতে বললেন, " দাদা ! জীবে জীবে খাদ্য খাদক সম্পর্ক। এতো সৃষ্টি থেকেই চলছে। এ আর নতুন কি ! একেই তো ফুড চেন বলে। সোনালীকে বোঝাও। এটাই সত্যি। "

- " আমরা এগুলোতে অভ্যস্ত নই, ঠাকুরপো। " মা বলেন।

- বৌদি ! প্রতিটা মানুষের কিছু হবি ও শখ থাকে, আমারও আছে। শিকার করে শিকারকে চোখের সামনে রেখে দিতে আমার বেশ ভালো লাগে। মনে হয়, আমি ওদের প্রভু। আমার এই অদ্ভুত শখ কেউ বরদাস্ত করতে পারবে না জেনে বিয়েও করিনি। আমি যেমন,তেমনই ভালো আছি । কারো জন্য নিজেকে পাল্টাতে পারবো না।

কাজিরঙায় আমাদের একসপ্তাহ থাকবার কথা ছিল। কিন্তু সুন্দর কাকুর বাড়িতে আমি এতো আতঙ্কে ছিলাম যে বাবা দু'দিনের মাথায় আমাদের নিয়ে গুয়াহাটি চলে আসেন। সেখানে চারদিন খুব আনন্দ করেছিলাম। অনেক জায়গা দেখে কামাখ্যা মন্দির দর্শন করে আমরা বাড়ি ফিরি।

-তারপর কী হলো মা?

-আমরা কলকাতা ফিরে এসে আবার যে যার মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আর এদিকে সুন্দরকাকু সরকারি চাকরি ছেড়ে সাউথ আফ্রিকা চলে যান। ওখানে পিলান্সবার্গ ন্যাশনাল পার্কের কাছে ডোম্বা ভিলেজে একটি একতলা বাংলো বাড়িতে উনি থাকতেন । স্টিভেন্স বলে একজন স্থানীয় ওনার সবসময়কার সঙ্গী ছিল। স্টিভেন্সের সাথে কাকুর ভীষণ ভাব হয়ে গেছিলো। স্টিভেনসও কাকুর পছন্দ অপছন্দের খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে খেয়াল রাখতো। ওখানে গিয়েও ওনার শিকারের নেশা কমে যায়নি,বরং বেড়ে গেছিলো।

একদিন রাতে মুষলধারে বৃষ্টি। পাওয়ার নেই। স্টিভেন্স তাড়াতাড়ি রান্না করে কাকুকে ডিনার করিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। পাওয়ার কাট। কাকু নিজের ঘরে একটা ক্যান্ডল জ্বালিয়ে বই পড়ছেন। বাইরে থেকে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছিলো, সেদিনকার বৃষ্টি বোধহয় পুরো পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। জানলার কাঁচ দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানোর আলো ঘরে ঢুকছিল। এই আলো –অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ ওনার মনে হলো ঘরের কোনায় আরো এক জোড়া আলো জ্বলজ্বল করছে। ভাবলেন দেখার ভুল নয়ত। কিছুতেই বইয়ে মন বসাতে পারলেন না। বারেবারে ঘরের কোনায় জ্বলজ্বল করতে থাকা আলোর দিকে চোখ যাচ্ছিলো। ব্যাপারটা কি বোঝার জন্য উনি বালিশের পাশে রাখা টর্চ জ্বেলে বিছানা থেকে নেমে এগোতে গিয়ে কিসে যেন হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। টর্চটাও হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেলো। হটাৎ দমকা হাওয়ায় জানলা খুলে গিয়ে মোমবাতিটাও নিভে গেলো। বিদ্যুতের আলোয় ঘরের পরিস্থিতি ঠাওর করে উঠবার চেষ্টা করলেন। জলের ছাঁটে ভিজে মেঝে পিছল হয়ে গিয়েছে। কোনোমতে মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে পড়ে গেলেন। এদিকে ঘরের কোনায় জ্বলতে থাকা আলোজোড়া ওনার দিকে খুব সন্তর্পনে এগিয়ে এসে ওনার মাথার কাছে কয়েক ইঞ্চি দূরে থেমে গেলো। ভালো করে দেখলেন, একটি ব্যাঘ্র শাবক। কিন্তু বন্ধ ঘরে এলো কী করে? দিনের বেলাতেই ঢুকে বসেছিল কি ? পাশের জঙ্গল থেকে কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে এলোই বা কী করে ? এধরণের নানা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো।

স্টিভেন্সকে ডাকবার চেষ্টা করলেন। একে অন্ধকার আবার অত বৃষ্টির আওয়াজ। ওনার আওয়াজ দরজার বাইরে গেলো বলে মনে হলো না। ছোট্ট বাঘটা কিছুই করছে না স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে ওনার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কি তীক্ষ্ণ আর অসহায় সেই দৃষ্টি। তাকানো যায় না ওর দিকে। আরেকবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার স্লিপ করে গেলেন। মনে হলো পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসছে আর দাঁড়াতে পারলেন না। মাথার সামনে বাঘের বাচ্চার চোখ দুটোর দিকে আবার নজর পড়লো। বাঘটা কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে । কোথায় দেখেছি একে ? একটু চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেলো কানহার জঙ্গলের সেই স্মৃতি। একটা বাঘের পরিবার। মা- বাবার ঘাড়ে মাথায় উঠে গিয়ে

একটা বাচ্চা খেলছে। থেকে থেকে মা-বাঘিনী বাচ্চাকে চেটে দিচ্ছে। ওদের সামনের ঝোপে সুন্দরবাবু রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে আছে সেটা ওরা টের পায়নি । এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায় ?

গুড়ুম ! গুড়ুম ! আকাশ ভেদী দুটো শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে বাঘ আর বাঘিনীর রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ছোট্ট বাঘ-ছানা কিছুই বুঝলো না হঠাৎ করে কী হয়ে গেলো ? যে মা ওকে আদর করছিলো সে আর নড়ছে না।

বীরদর্পে সুন্দর মৃত বাঘবাঘিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মুখে বিজয়ের হাসি। কাতর দৃষ্টিতে ছোট্ট শিশু সুন্দরের দিকে তাকিয়ে রইলো। "কেন এমন করলে?" বাঘ ছানার চোখে জিজ্ঞাসা।

উফফ ! সেতো কতবছর আগের কথা। সেই সুদূর কানহা থেকে বাঘের বাচ্চা পিলান্সবার্গে কিভাবে এসে পৌছালো ? এই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারছিলেন একটা ঠান্ডা কিছু ওনার গা বেয়ে উঠছে। বুঝলেন ওটা সরীসৃপ। ধীরেধীরে ওনাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে নিচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন দু হাত দিয়ে সরীসৃপের বাঁধন মুক্ত হওয়ার। শরীরের হাড় ভাঙার শব্দ উনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। নিজেকে মুক্ত করবার সব চেষ্টা অসফল হলো। ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। চোখ বুজে আসছে। বিদ্যুতের দমকা আলোয় খাটের রেলিঙের দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন ধনেশ পাখির পরিবার বসে আছে । যাদের ঠোঁট কাজিরাঙার বাড়িতে ডাইনিং স্পেসে সাজিয়ে রেখেছিলেন ।

এরা কেন আজ এখানে ? হ্যাঁ ! মনে পড়ছে, নতুন এয়ার রাইফেলটা এদের ওপরেই টেস্ট করেছিলাম। বাড়ির পেছনে বড় শিরিষ গাছের কোটরে ওর পরিবার ছিল। সেদিন প্রথম ওরা বাচ্চাদের উড়তে শেখাচ্ছিলো। আমার নতুন রাইফেলের কয়েকটা গুলিতেই সবাই ঝুপঝুপ করে আমার পায়ের সামনে পড়লো একেএকে। এদেরতো আমি কেটেকুটে ঠোঁট টুকু রেখে বাকি কবর দিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে এলো কিভাবে। কী ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। উফফ ! ওই দৃষ্টি সহ্য করতে পারছি না। সারা ঘরময় বনমুরগির বাচ্চা কিলবিল করছে। ওরাও গা বেয়ে উঠছে , কোনটা মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে ,কোনটা হাতের ওপর, কোনটা আবার বুকের ওপর উঠে বসে আছে। সরীসৃপটা শরীরের নিম্নাংশ গিলে ফেলেছে ,পা দুটোর আর সার নেই। কাজিরাঙায় একটা অজগর মেরে তার চামড়া দিয়ে আমি বেল্ট আর ওয়ালেট বানিয়েছিলাম। এই কি সেই সরীসৃপ ? আজ কি আমায় মেরে ফেলার জন্য সবাই দল বেঁধে এসেছে ?

স্টি ইইইই ভে এএএএএএএ ন্স, এ কী হচ্ছে ? জিভ জড়িয়ে আসছে ,গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। বাঁচাআআআও …….. , তোমরা ক্ষমা করে দাও আমাকে। আমি আর প্রাণী হত্যা করবো না। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন। চারিদিক অন্ধকার। শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই লড়াই করার। শেষ বারের মতো ডাকলেন, স্টিইইইভেন্স।

তারপর?

- পরদিন অনেক বেলা অবধি সুন্দর কাকুর সাড়াশব্দ না পেয়ে স্টিভেন্স দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। ঢুকে দেখে,সারা ঘর তছনছ , সুন্দর কাকু মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ওনার শরীর ঠান্ডা। তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স কল করে ওনাকে হাসপাতালে শিফট করা হয়। তখনও মাইল্ড হার্ট বীট ছিল। জানা গেলো ওনার "Ipsilateral Paralytical attack" এসেছিলো। কপাল ভালো, সময়মতো স্টিভেন্স দরজা ভেঙেছিল। বলে না, রাখে হরি মারে কে। সে যাত্রায় সুন্দর কাকু প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার জন্য বহুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। স্টিভেন্স এক মুহূর্তের জন্যেও ওনাকে একা ছাড়েনি।

প্রায় বছর বাদে কাকু যখন দেশে ফিরলেন, বাবা আর আমি ওনাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে গেছিলাম। কাকুকে দেখে আমি চমকে উঠি। সেই হিরোমার্কা চেহারা আর নেই। শরীর ভেঙে আধখানা হয়ে গেছে। ঠোঁটের কাছটা বেঁকে গেছে। বাবার সঙ্গে দেখা হতেই কাকু জড়িয়ে ধরে বলেন, " দাদা , আপনার কথাই ঠিক। আমার অপকর্মের শাস্তি আমি পেয়েছি। আর নয়। এবার আমি প্রাণী হত্যা করবো না। ওদের বাঁচাবো। আপনি আমার সাথে থাকবেন তো ?"

- নিশ্চয়ই থাকবো সুন্দর। ভালো কাজে অবশ্যই তোমার সঙ্গে থাকবো।

সেই থেকে বাবা ও কাকু দুজনে মিলে প্রাণী সংরক্ষণের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবীর দল গঠন করেন। পশুপাখিদের বিপদের কথা শুনলেই কাকু ছুটে যান। আপ্রাণ চেষ্টা করেন ওদের প্রাণ রক্ষার। ওনার কাজের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন। যখনই ঝড় এসে সুন্দরবন, কাকদ্বীপ এই অঞ্চলগুলো লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায় বিপর্যস্ত মানুষ ও পশুপাখিদের বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে উনি ঠিক সময়মতো পৌঁছে যান। সুন্দরবনে ওনার সংস্থা বাঘেদের বাঁচাবার জন্য বিশেষ ভাবে কাজ করছে।

~থ্যাংকু মা। বিন্দিয়া ম্যাম আমার গল্প পড়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

সন্ধেবেলা ঋভু খাতা কলম টেনে লিখতে শুরু করলো,
'সে অনেক দিন আগের কথা, সুন্দর দাদু তখন...'।

***

ভাগ্যশ্রী বেজ

আরাত্রিকা মন্ডল

প্রিয়াংসী সাহা

শৈকত সাউ

সুপর্ণা বণামাতি

রাশ্‌ল দে

পৃথা দে

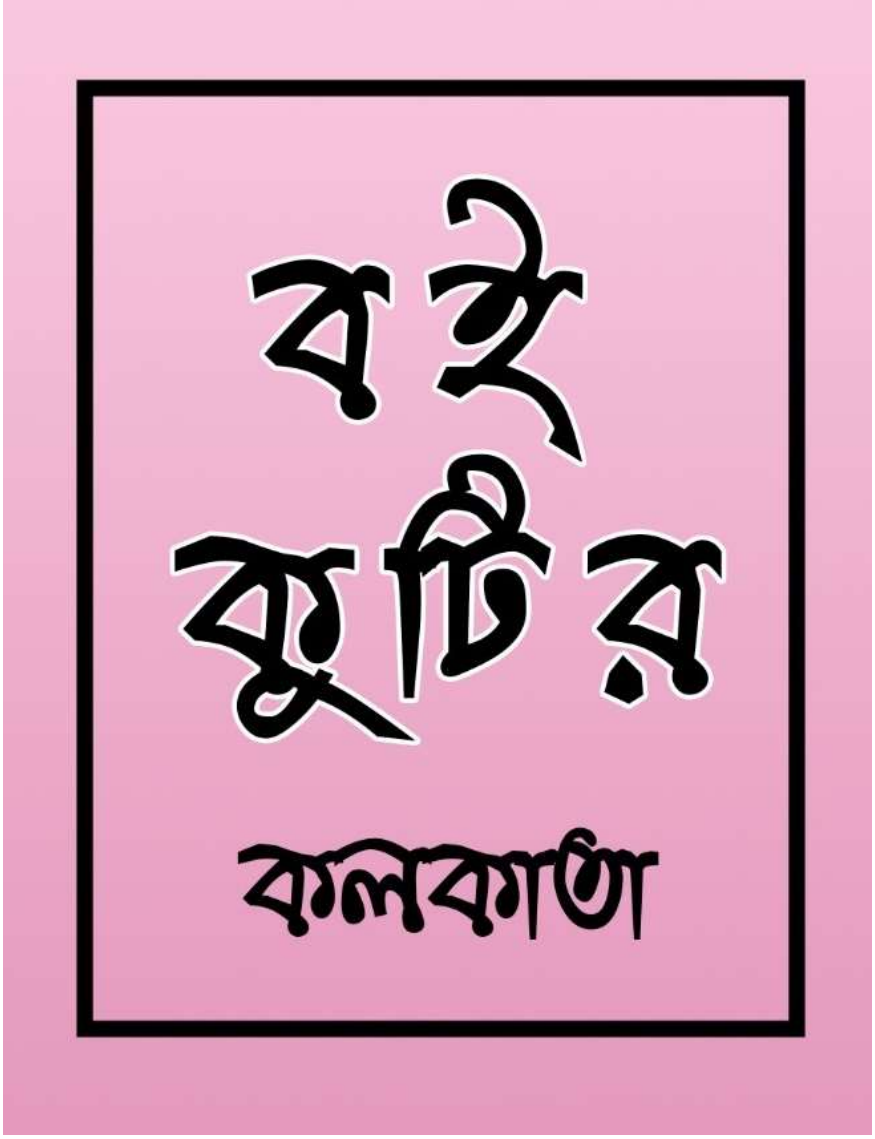

+91- 9903129991
boikutirkolkata@gmail.com
https://www.facebook.com/Boi-kutir-kolkata-বই-কুটির-কলকাতা-123508622632570/
https://www.boikutirkolkata.co.in
https://www.instagram.com/Boi_Kutir_Kolkata